বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি

আব্দুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া

অবস্থানঃ বরেন্দ্র অঞ্চল বা বর্তমান রাজশাহী বিভাগ ২৩-৪৮´-৩০´´ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬-৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮-০২´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ৮৯-৫৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এ স্থানের সামান্য দক্ষিণ (২৪ও২৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী স্থান) দিয়ে চলে গেছে। ৯০° পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিধায় ৮৮°২´ও ৮৯°- ৫৭´ দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এ স্থানও পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

সীমানাঃ এ স্থানের উত্তরে ভারতের পুর্নিয়া, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা সমূহ, পশ্চিমে ভারতের পুর্নিয়া, ভারতের দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা দুটি ও মালদহ জেলা, দক্ষিণে পদ্মা নদীর ওপারে অবস্থিত ভারতের মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাদ্বয় এবং বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ি জেলাদ্বয় এবং পুবে ভারতের ধুবড়ি জেলা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারে অবস্থিত ভারতের তরা জেলা ও যমুনা নদীর ওপারে অবস্থিত বাংলাদেশের জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা দুটি।

আয়তন ও লোকসংখ্যাঃ বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী এই পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত বরেন্দ্রভূমি তথা রাজশাহী বিভাগের আয়তন ১৩,৩৬৯বর্গমাইল

(৩৪,৬৫৪ বর্গ কিঃ মিঃ) ও ১৯৮১খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি মতে এর লোকসংখ্যা ২,১৮,৯৬,৮৯১ জন এবং প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা ১,৬৩৭ জন।

বিভাগ সৃষ্টির ইতিহাসঃ ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট থেকে সমগ্র বাঙলার দিওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের সনদ পাওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৈয়দ রেজা খানকে নায়েবনাজিম ও দিওয়ান নিযুক্ত করে মোটামুটিভাবে নবাবি আমলের মতই রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তৎপর হয়। কিন্তু তাতে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি রেজা খানকে বরখাস্ত করে এবং নিজেদের সুবিধা মত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের প্রায় প্রথম দশক থেকেই তারা বাঙলাকে বেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রত্যেক জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কালেক্টর নামক একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকতার উপর ন্যস্ত করার প্রথা প্রচলন করে। কিছুকাল পলে কালেক্টরদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রদান করা হয় এবং তখন তাদের পদবি হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর।

দিওয়ানি লাভের পর পরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তদারকি করার সুবিধার জন্য কয়েকটি সার্কিট সৃষ্টি করে। জেলা সৃষ্টির পরে সে সব সার্কিটের ভিত্তিতেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমগ্র বাঙলাকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এসব বিভাগ ছিল,(১) রাজশাহী, (২) বর্ধমান,(৩) প্রসিডেন্সি, (৪) ঢাকা ও (৫) চট্রগ্রাম। আমাদের আলোচ্য বিষয় রাজশাহী বিভাগের মধ্যেই ছিল বরেন্দ্রঅঞ্চল। এ সম্বন্ধে পরে মোটামুটি বিশদ আলোচনা আছে। তবে এখানে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, সমগ্র বাঙলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রাজশাহী বিভাগ সর্বমোট আটটি জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং সেগুলি ছিল,(১) দার্জিলিং, (২) জলপাইগুড়ি, (৩)মালদহ, (৪)দিনাজপুর ,(৫) রংপুর, (৬) বগুড়া, (৭) পাবনা ও (৮) রাজশাহী জেলা সমূহ। জলপাইগুড়ি জেলার লাগোয়া পুবে ও রংপুর জেলার লাগোয়া উত্তরে অবস্থিত দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ছিল রাজশাহী বিভাগের পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং একটি দেশীয় করদ রাজ্য।

বিভাগগুলির মধ্যে রাজশাহীর অবস্থা ছিল একটু বিচিত্র ধরনের। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও রংপুর জেলা ব্যতীত তখন প্রায় সমগ্র উত্তর বঙ্গ ছিল দুটি সুবৃহৎ জমিদারির অধীনে এবং এ দুটি ছিল নাটোর ও দিনাজপুর জমিদারি। নবাবি আমলে গঠিত নাটোর জমিদারির অধীনে ছিল প্রায় সমগ্র রাজশাহী ও পাবনা জেলাদ্বয় এবং আরও অনেক অঞ্চল। মোঘল আমলের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্টি দিনাজপুর জমিদারির অধীনে ছিল প্রায় সমগ্র অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা (বর্তমান কালের ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাসহ), বৃহত্তর বগুড়া জেলা, অবিভক্ত মালদহ জেলার অধিকাংশ এলাকা ও রংপুর জেলার কিছু অঞ্চল। তখন রংপুর জেলার অধিকাংশ এলাকা ছিল কোচবিহার রাজ্যের জমিদারির অন্তর্গত।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের সময় রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলা তিনটি (শেষোক্ত জেলা দুটির সামান্য অংশ ছাড়া) ও অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অর্ধাংশের চেয়ে সামান্য কম অঞ্চল ভারতের ভাগে পড়ে। মালদহ জেলার পাঁচটি থানা যথা, (১) চাঁপাইনবাবগঞ্জ, (২) শিবগঞ্জ, (৩) ভোলাহাট, (৪) নাচোল ও (৫)

গোমস্তাপুর – এই পাঁচটি থানা নিয়ে গঠিত হয় রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমা। আবার অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার পোরশা, পত্নীতলা ও ধামইরহাট থানা তিনটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। এই তিনটি থানাকে প্রথমে বগুড়া জেলার অধীন এবং পরে রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার অধীনে দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি জেলার (১) তেঁতুলিয়া, (২) পঞ্চগড়, (৩) দেবীগঞ্জ ও (৪) বোদা নামক চারটি থানা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে এবং সেগুলিকে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

পরে দিনাজপুর জেলায় একটি (পঞ্চগড়), রংপুর জেলায় একটি (লালমনির হাট) ও বগুড়া জেলায় আর একটি (জয়পুরহাট) মহকুমা সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আগের তেরটি সহ মোট ষোলটি মহকুমাকে জেলা বলে ঘোষণা করা হয় এবং সেই অনুসারে বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ রাজশাহী বিভাগে বর্তমানে মোট ১৬ টি জেলা আছে এবং সেগুলি হচ্ছে (১) পঞ্চগড়, (২) ঠাকুরগাঁও, (৩) দিনাজপুর, (৪) নীলফামারী, (৫) রংপুর, (৬) লালমনিরহাট, (৭) কুড়িগ্রাম, (৮) গাইবান্ধা, (৯) বগুড়া, (১০) জয়পুরহাট, (১১) সিরাজগঞ্জ, (১২) পাবনা, (১৩) নাটোর, (১৪) নওগাঁ, (১৫) রাজশাহী ও (১৬) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসমূহ।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রেডক্লিফ এওয়ার্ড অনুসারে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার অধীনস্থ ২৪,৭৪০ একর আয়তন বিশিষ্ট ৩৬টি মৌজা রাজশাহী জেলার সঙ্গে ও রাজশাহী জেলার ২২টি মৌজা ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

প্রাকৃতিক বিবরণ ঃ বরেন্দ্র অঞ্চল তথা রাজশাহী বিভাগ গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় মৌসুমি এলাকায় অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা যে এ অঞ্চলের নিকট দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ ও মোটামুটি আর্দ্র। আবহাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের সবচেয়ে চরমভাবাপন্ন এলাকাগুলির মধ্যে এ অঞ্চলের বেশ কিছু কিছু স্থান পড়ে। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের প্রায় শীর্ষস্থানে অবস্থিত সমুদ্র থেকে এ স্থানের দক্ষিণাঞ্চলের দূরত্ব দুই থেকে তিনশ মাইল (৩২০ থেকে ৪৮০ কিলোমিটার) উত্তরে এবং হিমালয় পর্বত থেকে এ অঞ্চলের মধ্যভাগ দক্ষিণে প্রায় সম দূরত্বে অবস্থিত। ফলে এ বিভাগের দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র এবং হিমালয়ের নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বলা চলে।

মৌসুমি অঞ্চলের অনেক দেশের মত বরেন্দ্র অঞ্চলের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয় ঋতু নিজস্ব ফলফুল, শস্যসম্ভার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং সূক্ষ্ম বিচারে তা সহজেই ধরা পড়ে। তবে বাংলাদেশের আবহাওয়াবিদদের মতে বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাপ মাত্রার তারতম্য ইত্যাদির ভিত্তিতে বরেন্দ্র অঞ্চলে সাধারণত সারা বছরে চার ধরনের আবহাওয়া

হেমন্ত কাল), সময়কাল হল আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) ও (ঘ) শীতকাল (আংশিক হেমন্ত, সমগ্র শীত ও বসন্ত কাল), সময়কাল হল অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ।

আর্দ্রতা ঃ পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত বরেন্দ্র অঞ্চলের সামগ্রিক আর্দ্রতা প্রায় সমভাবাপন্ন হলেও জেলাগুলিতে এ ব্যাপারে কিছুটা বিভিন্নতা দেখা যায়। দিনাজপুর জেলায় সাধারণত আর্দ্রতা প্রায় সারা বছরই বেশি থাকে এবং কদাচিৎ শতকরা ৬০ ভাগের নিচে নামে। তবে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মাঝে মাঝে তা শতকরা ১৬ ভাগ হয়ে যায়। আবার জুন-জুলাই মাসে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) মৌসুমি বায়ু প্রবাহ শুরু হলে তা ৮৪ থেকে ৯৬ ভাগ পর্যন্ত উন্নীত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর্দ্রতার মাত্রার একটা সমতা দেখা যায়। অক্টোবর মাস থেকে আর্দ্রতা চলতে থাকে এবং জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তা নামতে নামতে অনেক সময় ৬৭% ভাগে নেমে আসে। সাধারণত সারা বছর জেলার আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ১০৬% থেকে সর্বনিম্ন ১৬% ভাগ পর্যন্ত দেখা যায় এবং গড় আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৮৬% থেকে সর্বনিম্ন ৫৭% ভাগ পর্যন্ত দেখা যায়।

রাজশাহী জেলায় ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ৯ বছরের হিসাবে দেখা যায় যে, এখানে সর্বোচ্চ ১০০% থেকে সর্বনিম্ন ৩১% পর্যন্ত এবং গড় আর্দ্রতা ছিল ৭১% থেকে ৭৯% পর্যন্ত।

প্রায় অনুরূপ অবস্থা রংপুর জেলায়ও দেখা যায়। জেলায় ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে এবং তা গড়ে ৬৭-৭৩ শতাংশের কাছাকাছি থাকে। এর পরে আর্দ্রতার মাত্রা বেড়ে যায় এবং তা ভাদ্র আশ্বিনে (সেপ্টেম্বর মাসে) সবচেয়ে বেশি থাকে বলে দেখা যায়। বর্ষাকালে তা সব সময় ৮৩ শতাংশের বেশি থাকে। শীতকালেও আর্দ্রতা বেশি থাকে বলে দেখা যায়।

বগুড়া জেলার আর্দ্রতাও এ বিভাগের অন্যান্য জেলার মতই। এখানে সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ থেকে সর্বনিম্ন ৩৪ শতাংশ পর্যন্ত আর্দ্রতা দেখা যায়। সাধারণত শীতকালে বায়ু উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয় বলে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দক্ষিণ ও পূর্ব দক্ষিণ থেকে বায়ু প্রবাহের ফলে আর্দ্রতা সাধারণত বেশি থাকে।

পাবনা জেলার আর্দ্রতাও মোটামুটি বগুড়া জেলার মত তবে এখানকার সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৮৯ শতাংশ থেকে সর্বনিম্ন ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত দেখা গেছে।

বৃষ্টিপাতঃ সাধারণত এ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বৃষ্টিপাতের বার্ষিক বিভিন্ন গড় দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিনাজপুর জেলায় বার্ষিক গড় ১৮১৩ মিলিমিটার, রংপুর জেলায় ২৩২৪ মিলিমিটার, বগুড়া জেলায় ১৮১৪ মিলিমিটার, পাবনা জেলায় ২২০০ মিলিমিটার ও রাজশাহী জেলায় ১৭০৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে কয়েক বছরের হিসাবে ধরা পড়েছে। তাতে সমগ্র বিভাগে গড়ে ১৯৭১ মিলিমিটার(প্রায় ৬৬ ইঞ্চি) হয়েছিল বলে ধরা যায়।

বায়ুপ্রবাহঃ কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময় (নভেম্বর) থেকে সাধারণত উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে এবং তখন থেকেই কিছুটা শীতের প্রকোপ দেখা যায়।

শীতকালের এই ঠান্ডা বাতাস মাঘ মাসের শেষ(ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত বইতে থাকে। এর পরে দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীর কিছু কিছু অঞ্চলে পশ্চিম দিক থেকে গরম "লু " হাওয়া বইতে থাকে। মার্চ-এপ্রিল মাসে বায়ুর গতি পরিবর্তিত হয় এবং দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বায়ু প্রবাহ বইতে দেখা যায়। প্রাক-মৌসুমি কালের এই বায়ুই পরে জুন-অক্টোবর(জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন) মাসগুলিতে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত হয়ে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। চৈত্র-বৈশাখ(এপ্রিল-মে) মাসে এ অঞ্চলে প্রবল ঝড়-তুফান হয় এবং স্থানীয় ভাষায় একে কাল-বৈশাখি বলা হয়।

তাপমাত্রাঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বরেন্দ্র ভূমির তাপমাত্রার বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চলে তাপমাত্রার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও তাতে মূলগত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তা সাধারণত গড়ে সর্বোচ্চ ৩৫ডিগ্রি সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হয় না। আবার শীতকালে অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ(ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) মাসে তাপমাত্রা নিচে নেমে যায়,এবং গড়ে তা থাকে সাধরণত ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এমনও দেখা গেছে যে গ্রীষ্মকালে কোন কোন বছর দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী জেলার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে যায়। রাজশাহী জেলার লালপুরে তেমন একটি স্থান আছে এবং সেখানে মাঝে মাঝে তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে যায়। আবার দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কোন কোন স্থানে শীতকালে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়।

নামকরণঃ বরেন্দ্র শব্দের সরল ও ব্যাকরণ-সম্মত অর্থ হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের বরে(বর+ইন্দ্র) অর্থাৎ অনুগ্রহ, কল্যাণ বা আশীবাদে সৃষ্টি অর্থাৎ ইন্দ্রের করুণা, অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ প্রাপ্ত দেশ। পৌরাণিক অথবা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের যুগে যখন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার অস্তিত্বের কথা বলা হয়ে থাকে তখন কিন্ত এ দেশটির নাম বরেন্দ্র ছিল না। তখন এর নাম পুণ্ড্র ছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

পুণ্ড্রদেশের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক যুগে ঐতেরয় মুনিদ্বারা কৃত ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। বায়ু, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, অপুত্রক বলিরাজা পুত্রার্থে বৃদ্ধ আর্য ঋষি দীর্ঘতমাকে নিয়োগ করেন এবং দীর্ঘতমার ঔরসে ও বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে বলিরাজার যে পাঁচটি পুত্র হয় তাঁদের নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ,পুণ্ড্র ও সুহ্ম এবং তাঁদের নামে পাঁচটি জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাভারতে পুণ্ড্ররাজ্যের কথা অনেকবার উল্লিখিত আছে। কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীম পুণ্ড্র রাজ্য অধিকার করেছিলেন বলে সেখানে বর্ণিত আছে। মহাভারতে আরও বর্ণিত আছে যে, পৌণ্ড্রিক বাসুদেব নামক পুণ্ড্রদেশের এক নৃপতি বঙ্গ,পুণ্ড্র ও কিরাতদের এক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করে মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পুণ্ড্রদেশের নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন বলে মহাভারতে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তা খুবই উল্লেখযোগ্য। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পুরাণ বা মহাভারতের যুগে বরেন্দ্র নামের উল্লেখ কোথাও দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক কালেও।

মৌর্যসম্রাট অশোকের (খ্রিঃ পূঃ ২৭৩-২৩২ অব্দ) কোন কোন শিলালিপিতে কয়েকটি বহুদূরবর্তী প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে 'পরিংদগণ' অন্যতম। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পরিংদ নামটি 'বরিন্দ' 'বরিন্দ' বা 'বরেন্দ্র' নামেরই নামান্তর।[১] অন্য কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণের অভাবে শুধু এই পরিংদ নাম থেকেই সে যুগে বরেন্দ্র নামের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়।

পালযুগের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দশম শতাব্দীর দিকে বরেন্দ্র নামক জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম' নামক কাব্য গ্রন্থে। সেখানে কবি প্রশস্তিতে আছে,

বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ কুল স্থানম।
শ্রী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভব্বৃহদ্ঘটু ॥[২]

অর্থাৎ, পুণ্ড্রবর্ধন পুরের নিকটবর্তী বৃহদ্ঘটু নামক পুণ্যভূমিতে কবির নিবাস, এ স্থান ধরণির শ্রেষ্ঠ (শির) বরেন্দ্র মণ্ডলের চূড়ামণি।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, ৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি দক্ষিণী লিপিতে বরেন্দ্রদ্যুতিকারিণ ও গৌড়চূড়ামণি নামক জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, "বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে বরেন্দ্রীর উল্লেখ আছে। কিন্তু সিলিমপুর শিলালিপি, তর্পণ দিঘি এবং মাধাইনগর পট্টোলি তিনটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে বরেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধন ভূমির অন্তর্গত ছিল। সেন রাজাদের পট্টোলি গুলিতে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে এ অনুমান নিঃসন্দেহে করা যায় যে, বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা, এবং হয়তো পাবনা (পদুষা?) প্রাচীন বরেন্দ্রীর প্রতিনিধি।"[৪]

উত্তর বঙ্গ অর্থাৎ গৌড়-লক্ষ্মণাবতী এবং সে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলসহ সমগ্র অবিভক্ত বাঙলার আধিপতি ছিলেন সেনবংশীয় নৃপতি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন। তিনি ১২০৪ কি ১২০৫ খিষ্টাব্দে তুরকি সমরনায়ক ইখতিয়ার উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক পরাজিত হয়ে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে বঙ্গে পলায়ন করেন এবং ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মীনহাজ-ই-সিরাজ ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে বলেন যে গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল 'রাল' (রাঢ়) নামে পরিচিত ছিল এবং সে অঞ্চলেই ছিল লাখনোর, (বীরভূম জেলার নাগর) নামক শহর এবং নদীর পূর্ববর্তী অঞ্চলে ছিল 'বরিন্দ্র' বা 'বরেন্দ্র' নামক দেশ এবং সেখানেই ছিল দেবকোট (অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত কোটিবর্ষ বা বাণগড়) নামক প্রাচীন নগর।[৫]

মীনহাজের বর্ণনা এবং পাল সেন নৃপতিদের তাম্রলিপি সমূহ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে সময়ে উত্তর বাংলার বরিন্দ অর্থাৎ বরেন্দ্র নাম খুবই সুপরিচিত ছিল।

ভূ-তাত্ত্বিক ভিত্তি, গঠন ও মূল্যবান খনিজ সম্পদঃ * সমগ্র বাংলাদেশের উপরের ভূ-স্তরে যে পলিমাটির আস্তরণ দেখা যায় তা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই নবগঠিত পলিমাটির নিচেই আছে কোন কোন স্থানে প্রাচীন পলিমাটি বা মধুপুর কাদা বা বরেন্দ্রভূমির অস্তিত্ব। এই সামান্য অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের বাকি প্রায় সমগ্র অঞ্চলই হাজার হাজার ফুট গভীর নতুন পলিমাটি দ্বারা আবৃত এবং এসবের নিচে আছে কোটি কোটি বছরের পুরাতন শিলা।

ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে প্রায় ৬০ কোটি বছরেরও অধিক কাল আগের আর্কিয়ান শিলা (Archian Rocks) বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর জেলাত্রয়ের উত্তরভাগে এবং খুব সম্ভবত সমগ্র বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার তলদেশে এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫০০ থেকে ১০০০ হাজার ফুট নিচেই বিদ্যমান। তাঁদের মতে এদেশের অন্যান্য জেলার তলদেশেও এ শিলার অস্তিত্ব আছে। তবে তা হাজার হাজার ফুট পলির নিচে অবস্থিত এবং এই পলিমাটি 'টারশিয়ারি' (Tertiary) যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের সঞ্চয় বলে তাঁদের অভিমত। টারশিয়ারি যুগের বয়স ৭ থেকে ৪ কোটি বছর বলে পণ্ডিতেরা ধারণা করে থাকেন এবং তাঁদের মতে 'প্যালিওসিন' (Paleocene), প্রায় ৬ কোটি বছরের পুরাতন 'ইওসিন' (Eocene), প্রায় ৪ কোটি বছরের প্রাচীন 'অলিগোসিন' (Oligocene), প্রায় ২.৫ কোটি বছরের প্রাচীন 'মাইওসিন' (Miocene) ও প্রায় ১.২ কোটি বছরের প্রাচীন 'প্লাইওসিন' (Pliocene) প্রভৃতি যুগ এই টারশিয়ারি যুগের মধ্যে পড়ে।

রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'গন্ডোয়ানা' (Condwanas) নামে অধিক পরিচিত 'পারমিয়ান' (Permian) শিলা প্রাচীন আর্কিয়ান শিলার ঠিক উপরের স্তরেই অবস্থিত এবং তাতে ধারণা করা হয় যে, সমগ্র বাংলাদেশে প্রাচীন আর্কিয়ান যুগ থেকে শুরু করে কয়লা উৎপাদনকারী 'কারবনিফরাস'(Carboniforous) যুগ পর্যন্ত স্থলভাগ বিদ্যমান ছিল। পারমিয়ান বা গন্ডোয়ানা যুগের বয়স ২২.৫ থেকে ৩৫ কোটি বছর হবে বলে ভূ-তাত্ত্বিকদের অভিমত। এযুগেই বাঙলার ভূ-পৃষ্ঠে বর্তমান কালের বিল বা জলাভূমির মত নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়েছিল ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় (erosion) অথবা ভূমি পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার কারণে। এসব নিম্নভূমির চারদিকে ছিল অতিশয় সমৃদ্ধ অরণ্যাঞ্চল। সে সব স্থান থেকে অজস্র বনজ দ্রব্যাদি স্রোতের জলে ভেসে এসে নিম্নভূমিতে স্তূপীকৃত হয়। পরবর্তী কালে প্রায় ২২ থেকে ৭ কোটি বছর আগেকার ' মেসোজয়িক' (Mesojoic Era) যুগে এগুলির অজস্র তলানি স্তূপীকৃত হয় এবং এগুলি সরে যাওয়ার পথ রোধ করে। এসব দ্রব্যাদির চাপে ও তাপে এবং হিমালয় পর্বত সৃষ্টির কারণে এসব বনজ দ্রব্যাদি কয়লাতে রূপান্তরিত হয়।

মেসোজয়িক যুগের শেষদিকে বাঙলার সমগ্র অঞ্চলে স্থলভাগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সমগ্র মেসোজয়িক তলানি এবং সেই সঙ্গে গন্ডোয়ানা গঠনেরও কিছু কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি থেকে উৎপন্ন

---

* প্রবন্ধের এই অংশ ও ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও পরিচিতি সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ও অনুজপ্রতিম এম. এ. জাহেরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

যেসব শিলার অস্তিত্ব দেখা যায় তাতে মনে হয় যে, উপমহাদেশে সে সময়ে যে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছিল এগুলিও তা থেকে রক্ষা পায় নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় ৫০ কোটি বছর আগেকার 'ক্যাম্ব্রিয়ান' (Cambrian Era) যুগ অথবা এর পরবর্তী কাল জোরাসিক (Jurasic Era) যুগের কোন শিলার নমুনা বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নি।

শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র উপমহাদেশে টারশিয়ারি যুগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এযুগেই এ অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-বিন্যাস সূচিত হয় এবং বর্তমান কালে সমগ্র অঞ্চলে যে রূপরেখা (configuration) দেখা যাচ্ছে তার গঠন এ যুগেই সূচিত হয়েছিল। তবে ইয়োসিন (Eocene) যুগের মধ্যবর্তী সময়ে ভূ-গঠনের যে প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয় তাতে প্রাচীন গন্ডোয়ানা যুগের ভূমির মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছিল বলে দেখা যায় এবং এর অংশবিশেষ হিসাবে বাংলাদেশও এর প্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পায় নি। টেথিয়ান (Tethyan) ভূ-প্রক্রিয়া নামে পরিচিত এই ভূ-আন্দোলনের ফলে হিমালয় পর্বতের উচ্চতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত অতি সামান্য ও সংকীর্ণ অংশ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ দক্ষিণ দিক থেকে আগত সমুদ্র দ্বারা নিমজ্জিত হয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে চুনাপাথরের (limestone) অস্তিত্ব দেখে। সিলেট চুনা পাথর (Sylhet limestone) নামে কথিত এ পাথর শ্রীহট্ট জেলার টেকেরঘাট নামক স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়, রাজশাহী অঞ্চলে প্রায় ১০০০ ফুট মাটির নিচে এবং বাংলাদেশের অন্যত্র গভীর মাটির নিচে দেখা যায়।

অলিগোসিন শিলা (Olygocene rocks) বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায় নি, ভূমির উপর তো নয়ই, এদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ড্রিলিং প্রক্রিয়া চলেছে সে সব স্থানের কোথাও এ পাথরের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাতে পণ্ডিতেরা ধারণা করেন যে, এযুগে বাংলাদেশে ভূমিস্তরের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এ যুগের শেষ দিকে এবং মাইওসিন যুগের শুরুতে প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে এ দেশটা আবারও সাগরের নিচে চলে যায়। এর পরে সুবিশাল হিমালয় পর্বত থেকে বিভিন্ন জলধারা দ্বারা বাহিত প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ফুট পলি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্তূপীকৃত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র অঞ্চল, চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ অঞ্চল, শ্রীহট্ট জেলার অনেক অঞ্চল এ পলিদ্বারা গঠিত। এ সম্বন্ধে অবশ্য ভিন্ন মতও আছে। রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলাগুলির বহুস্থানে খুবই অগভীরে (মাত্র ৪০০ ফুট মাটির নিচে) এ পলির আবরণের আরম্ভ দেখা যায়। এর নিচেই পাওয়া যায় গন্ডোয়ানা যুগের বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যত্র এ পলির গভীরতা প্রায় ৩০,০০০ ফুট নিচে বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রায় ১.২ কোটি বছর আগেকার প্লাইওসিন (Pliocene) যুগে বাংলাদেশ আবারও উপমহাদেশীয় প্রাকৃতিক অবস্থার আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। গঙ্গা/পদ্মা নদীর উত্তরে অবস্থিত বরেন্দ্র অঞ্চলে যে নুড়ি পাথর (pebbles), বালু (sand) , মধুপুর কাদামাটি (Madhupur clay) নামে পরিচিত মাটি

ইত্যাদি দেখা যায়, সেগুলি প্লাইওসিন যুগের প্লাবনের অবদান বলে ভূ-তাত্ত্বিকদের অভিমত। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের বর্তমান কালের যে বাহ্যিক গঠন (Configuration) দেখা যায়, তা যে প্লাইওসিন যুগের শেষ দিক থেকে সূচিত হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে তাতে পণ্ডিতমহলে কোন সংশয় নেই।

উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়া সমূহের ফলে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বকোণে কতগুলি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের (zone) সৃষ্টি হয়। এগুলিকে পূর্বদিকে মায়ানমারের 'আরাকান ইয়োমাই ফোল্ডেড সিসটেম' (Arakan comai Folded System), উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'শিলং মাসিফ', (Shillong Massif), উত্তর-পশ্চিমে 'হিমালয়ান ফোরডিপ' (Himalayan Foredeep) এবং পশ্চিমে 'ইন্ডিয়ান প্লাটফর্ম', (Indian Platform) নামে অভিহিত করা হয়। খোদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও কতগুলি ভূ-গাঠনিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বরেন্দ্র এলাকার উত্তর-পশ্চিমভাগে অবস্থিত অঞ্চলকে 'নর্দান স্লোপ' (Northern Slope) বা 'রংপুর স্যাডল' (Rangpur Saddle) বা 'দিনাজপুর স্লোপ' (Dinajpur Slope), এর দক্ষিণাঞ্চলকে 'সাউদার্ণ স্যাড্‌ল্' (Southern Saddle) বা 'রংপুর স্যাড্‌ল' (Rangpur Saddle) এবং এর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলকে 'রংপুরের দক্ষিণ স্লোপ, (Southern Slope of Rangpur) বা 'বগুড়া স্লোপ' (Bogra Slope) বলা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঢাকা ও খুলনা বিভাগকে মোটামুটি ভাবে 'বেঙ্গল ফোরডিপ' (Bengal Foredeep), শ্রীহট্ট বিভাগকে 'সিলেট ট্রাফ' (Sylhet Trough), বরিশাল বিভাগসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে 'বরিশাল হাই' (Barishal High), 'বেঙ্গল ফোরডিপ' ও বরেন্দ্র ভূমির মধ্যবর্তী উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি সংকীর্ণ ভূ-খণ্ডকে 'হিন্‌জ্ জোন' (Hinge zone) এবং শিলং মাসিফ-এর নিচে ও সিলেট ট্রাফ-এর উত্তরে ও বরেন্দ্র ভূমির উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এক খণ্ড সংকীর্ণ ভূমিকে 'সাউথ শিলং শেল্‌ফ্' (South Shillong Shelf) বলা হয়ে থাকে।

খনিজ সম্পদঃ কয়লা (coal), পিটকয়লা (peat coal), কঠিন শিলা (hard rock), গ্রাভেল (gravel), চুনাপাথর (limestone), সাদামাটি (white clay), 'গ্লাস স্যান্ড' (glass sand), খনিজ বালি (mineral sand), তামা (copper) ইত্যাদি বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, তখন পর্যন্ত খনিজ দ্রব্যাদি আবিষ্কারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মোট ৩১টি কূপ বরেন্দ্র অঞ্চলে খনন করা হয়েছিল। এর ফলে এ অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সব কূপের মধ্যে ১৩টি বগুড়া, ৮টি রাজশাহী, ৩টি রংপুর ও দিনাপজুর জেলায় ৭টি কূপ খনন করা হয়েছিল।[৬]

এগুলির মধ্যে বগুড়া জেলার ২টি কূপে কয়লা, একই জেলার ১২টি কূপে ও রাজশাহী জেলার ৬টি কূপে সিলেট চুনাপাথর এবং দিনাজপুর জেলার ৭টি কূপে কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে রংপুর জেলার ৬টি কূপেও কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং বগুড়া জেলার কয়েকটি কূপে চুনাপাথরের সঙ্গে কঠিন শিলা স্তরের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে ধারণা করা হয় যে, বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে কয়লা, চুনাপাথর ও কঠিন শিলা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নিচে এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল।

কয়লাঃ বগুড়া জেলার জামালগঞ্জে ও রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলে বেলেপাথর (sand stone) ও 'শেইল' (shale)-এর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় কয়লা পাওয়া গেছে। ২২০০ তেকে ৩০০০ ফুট মাটির নিচে প্রাপ্ত এ কয়লার বেধ (thickness) হবে ৫ থেকে ১৪০ ফুট। পারমিয়ান অর্থাৎ গণ্ডোয়ানা যুগের এ কয়লা বেশ উন্নতমানের এবং এর পরিমাণ হবে প্রায় ৫২৭ মিলিয়ন (৫২.৭ কোটি) টন। বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদ জনাব এম, এ, জাহের ও জনাব ওয়াহিদ-উদ- দীনের মতে প্রায় ১৬ বর্গমাইল স্থান জুড়ে এই কয়লার অবস্থান এবং মজুদ কয়লার পরিমাণ হবে প্রায় ৭৬০ মিলিয়ন (৭৬ কোটি) টন। ভূ-প্রকৃতিগত পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে তাঁরা আরও বলেন যে, পুবে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানা থেকে পশ্চিমে রাজশাহী জেলার আত্রাই নদী পর্যন্ত স্থানে এ কয়লার অস্তিত্ব আছে এবং তা ২০০০ থেকে ৪০০০ ফুট মাটির নিচে পাওয়া যাবে। তাতে এ স্থানে মজুদ কয়লার পরিমাণ যে আরও অনেক বেশি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপরে উল্লিখিত স্থান ছাড়া আরও ৪টি স্থানে কয়লা পাওয়া গেছে এবং সেগুলি হচ্ছে (১) দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি, (২) একই জেলার দিঘির পাড় কয়লা খনি, (৩) রংপুর জেলার খালিশপুর কয়লা খনি ও (৪) আর একটি কয়লার খনি (এর পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় নি)। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রাপ্তি স্থানের প্রায় কাছাকাছি স্থানে (ফুলবাড়ি থানা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে) একটি কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।

গন্ডোয়ানা যুগের এ কয়লা বেশ উন্নত মানের। প্রায় ৪২৫ ফুট মাটির নিচে প্রাপ্ত এ কয়লার পরিমাণ হবে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন (৩০ কোটি) টন। দিঘির পাড় কয়লা খনিতে প্রাপ্ত কয়লাও প্রায় অনুরূপ মানের এবং প্রায় ১০৭৫ ফুট মাটির নিচে প্রাপ্ত এ কয়লার পরিমাণ এখনও (১৯৯৭ খ্রিঃ) নির্ধারিত হয় নি। খালিশপুরে প্রাপ্ত কয়লার মানও প্রায় অনুরূপ। সেখানে প্রায় ১০৭৫ ফুট মাটির নিচে প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণ হবে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন (৪০ কোটি) টন। বড় পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কয়লা উত্তোলনের কাজ চলছে বলে জানা গেছে।

চুনাপাথরঃ সিলেট চুনাপাথর নামে অভিহিত এ পাথরের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। টারশিয়ারি যুগে প্রাচীনতম কাল ইউসিন (Eocene) যুগের এ পাথর জয়পুরহাট ও এর চারদিকে ১৩৪৫ থেকে ১৯১০ ফুট নিচে অবস্থিত। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ স্থানে ১৪টি কূপ খনন করা হয়েছে এবং তাতে ১৫০ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে চুনাপাথর আছে বলে জানা গেছে। এ স্থানে এ পাথরের গড় বেধ (thickness) প্রায় ৬০ ফুট। এখানে ১২ বিলিয়ন (১২০০০ কোটি) টনের অধিক চুনাপাথর পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এ অঞ্চলের যেসব স্থানে কূপ খনন করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে, বৃহত্তর বগুড়া জেলার (১) কুচমা, (২) বগুড়া শহরের নিকটবর্তী দুর্গাদহ, , (৩) খঞ্জনপুর, (৪) ইনশিরা, (৫) বুজরগ, (৬) রকিন্দ্রপুর, (৭) পুবা, (৮) দুদ্রজন্তিগ্রাম, (৯) জগদীশপুর, (১০) জয়পুরহাট প্রথম ও (১১) জয়পুরহাট দ্বিতীয়। তাছাড়া, বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গোয়ালভিটা, চককমল, তাহিরপুর, চকরিয়াখান, আমবাটী প্রভৃতি স্থানেও কূপ খনন করে চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পরবর্তীকালে প্রস্তাবিত জয়পুরহাট মাইন সাইটে (Joypurhat Mine Site) বি. এম. ই. ডি. সি. (B.M.E.D.C)-এর অনুরোধে বাংলাদেশ ভূ তত্ত্ব জরিপ দফতর কর্তৃক আরও দুটি কূপ খনন করা হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, প্রায় আড়াই বর্গমাইল স্থান জুড়ে প্রায় ২৭০ মিলিয়ন (২৭ কোটি) টন চুনাপাথর মজুদ আছে।

বাংলাদেশে যে চুনাপাথর পাওয়া গেছে তা বেশ উৎকৃষ্ট মানের এবং সিমেন্ট প্রস্তুত করার জন্য তা খুবই উপযোগী বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

কঠিন শিলাঃ প্রায় ৬০ কোটি বছরেরও অধিক প্রাচীন আর্কিয়ান শিলা (Basement Complex) বরেন্দ্রভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির নিচে বিভিন্ন স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে যেসব কূপ খনন করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, লালপুকুর, গাইবান্ধার হাটদরিয়াপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া , গুড়গুড়ি, খাগড়াবান্ধা, বুড়িয়রডোবা ও পশ্চিম গুড়গুড়ি নামক বিভিন্ন স্থানে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত এই কঠিন শিলা ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে আছে। দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পূবে অবস্থিত কঠিন শিলার অবস্থান ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৪২২ ফুট, নিকটবর্তী রানিপুকুর শিলার অবস্থান মাত্র ৫৬২ ফুট, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার মিঠাপুকুর শিলার অবস্থান ৮৬২ ফুট ও বগুড়া জেলার খঞ্জনপুরের শিলার অবস্থান প্রায় ২০০০ ফুট মাটির নিচে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত কঠিন শিলার মধ্যে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই শিলার মধ্যে আছে গ্রানাইট (Granodiorite), কোয়ার্টো ডাইয়োরাইট (Quartdiorite), নিস (Gneiss), ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের শিলা। এসব শিলা বেশ উন্নত মানের এবং নির্মাণ কাজের জন্য খুবই উপযোগী বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তাঁদের মতে এ শিলার পরিমাণ অফুরন্ত। মধ্যপাড়া শিলা উত্তোলনের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

সাদামাটি (White Clay) ঃ রাজশাহী জেলার পত্নীতলা থানার অধীনস্থ আমবাটী নামক গ্রামে দুটি কূপ খনন করার পর দেখা গেছে যে, প্রাচীন চুনাপাথরের স্তরের উপরে একটি কূপে ১৩৩১ ফুট ও অন্যটিতে ১৩১৬ ফুট মাটির নিচে প্রায় ৩০ ফুট বেধ (Thickness) বিশিষ্ট সাদামাটি (White Clay) পাওয়া গেছে এবং তা মোটামুটি উন্নতমানের। তবে মাত্র দুটি কূপ খনন করা হয়েছে বলে সমগ্র স্থানে অবস্থিত সাদামাটির আয়তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় নি।

দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়াতে কঠিন শিলার জন্য যে কূপ খনন করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ৪২২ থেকে ৫১৩ ফুট মাটির নিচে খনিত ৪টি কূপে কঠিন শিলাস্তরের উপরে সাদামাটি পাওয়া গেছে এবং এ মটিও মোটামুটি উন্নত মানের বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

চীনামাটির বাসন-কোসন, কাগজ, রবার, বস্ত্র, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর ইত্যাদি শিল্পে সাদামাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

থানার অংশ বিশেষ নিয়ে রাজশাহী জেলায় বরেন্দ্র অঞ্চল গঠিত। আবার ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, ফুলবাড়ি, পার্বতীপুর, চিরির বন্দর, দিনাজপুর সদর, বিরল, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, পীরগঞ্জ, রানী সংকইল, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গি প্রভৃতি থানার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং বীরগঞ্জ, খানসামা, ঠাকুরগাঁও ও আটোয়ারি থানার অংশ বিশেষ নিয়ে দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশে বরেন্দ্র ভূমির অস্তিত্ব দেখা যায়। গোবিন্দগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জ থানা সমূহের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং পলাশবাড়ি, রংপুর সদর, তারাগঞ্জ, সৈয়দপুর ও নীলফামারী থানা সমূহের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত রংপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বরেন্দ্রভূমির অস্তিত্ব দেখা যায়। করতোয়া নদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গাবতলী, সারিয়াকান্দি ও ধুনট থানাগুলির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং বগুড়া সদর, শেরপুর প্রভৃতি থানার কিছু অংশ বাদ দিয়ে করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে লালমাটিতে গঠিত যে অঞ্চল আছে তা যে সবই বরেন্দ্র বা খিয়ার অঞ্চল নামে অভিহিত তা বলাই বাহুল্য। বৃহত্তর পাবনা জেলার মধ্যে কেবল তাড়াশ থানার অধিকাংশ অঞ্চল ও রায়গঞ্জ থানার অংশ বিশেষ বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

বাংলাদেশের আর সব অঞ্চল থেকে বরেন্দ্র ভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং বর্ষাকালে তা পানির নিচে তলিয়ে যায় না। বর্ষাকালে ভূমির চারদিকে উঁচু আল বেঁধে পানি সঞ্চয় করে কৃষকেরা এসব জমিতে রোপা ধানের চাষ করে এবং তাতে খুব ভাল ফলন হয়।

এ অঞ্চলের ভূমি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, এই বিরাট আকারের সমতল ভূমি অববাহিকার অবশিষ্ট ভূমি থেকে প্রাচীনতর এবং 'ভাঙ্গর' *(Bhangar)* নামে পরিচিত এই প্রাচীন পলিমাটির ভূমি ঈষৎ বিবর্ণ লালচে, ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণের এবং নখুন করে অনাবৃত হলে তা কিছুটা হলুদ বর্ণের দেখা যায়। এই ভূমির প্রায় সর্বত্র কমবেশি কঙ্কর দেখা যায়। স্থানে স্থানে বিশেষ করে, বাঙলা ও বিহার রাজ্যে সরিষা থেকে মটর দানার আকৃতিবিশিষ্ট জলযোজিত অম্লজানের সর্বাধিক জারক দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্রাকারের বেলে পাথরের কণা (Pisolitic concreations of hydrated iron peroxide) এ মাটিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। কোন কোন সময় এসব গোলাকার বস্তুগুলি বৃহত্তর আকারের হয় এবং দিনাজপুর জেলার নিকটবর্তী অঞ্চলে তা কবুতরের ডিমের আয়তন বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদ আর, ডি, ওলড্‌হ্যাম (R.D. Oldham) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ[৭]

" The older alluvium *(bhangar)* is usually composed of massive clay beds of a rather pale, reddish brown colour, very often yellowish when recently exposed to the air, with more or less *kankar* disseminated throughout. In places, and especially in Bengal and Bihar, pisolitic concretions of hydrated iron peroxide, from the size of a mustard seed to that of a pea , are disseminated through the clay; occasionally these modules attain larger dimensions, some being found, near Dinajpur of the size of pigeons' eggs. In places *kankar*

forms compact beds of earthy limestone. Sand, gravels and conglomerates occur, but are, as a rule, subordinate, except on the edges of the valley, the quantity of the sand in the clay decreasing gradually as the distance from the hills increases. Pebbles are scarce at a greater distance than from 20 to 30 miles from the hills bordering the plain. Beds of sandstone, sufficiently compact for building, have occasionally been found, but are of rare occurance. On the whole, there is no great differance between the alluvial formation of the Indo-gangetic plain and those those of the Norbada and Tapti, except that the latter are rather darker in colour, and perhaps less sandy.

"The greater alluvial *(Kankar)* deposits consist of coarsegravels near the hills and expecially at the base of the Himalayas, sandy clay and sand along the course of the rivers, and fine silt consolidating into clay in the delta in the flatter parts of the river plain. In the ganges delta beds of impure peat commonly occur. Fresh watershells are of more frequent occurance in the newer forms of alluviam than in the older, the species being those now living in the rivers and marshes of the country." (R.D. Oldham, 1893, pp-411-32)

(২) পলিমাটিতে গঠিত উঁচু ভূমিঃ উপরে উল্লিখিত লালমাটিতে গঠিত উঁচু ভূমি (বরেন্দ্র ভূমি) ছাড়াও বরেন্দ্র অঞ্চলে অর্থাৎ রাজশাহী বিভাগে আরও কিছু উচুঁ ভূমি আছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে পলিমাটিতে গঠিত এসব ভূমি মোটামুটি প্রাচীন এবং বর্ষাকালে তা পানির নিচে তলিয়ে যায় না। বরেন্দ্রভূমির মত এসব ভূমিতেও বর্ষাকালে উঁচু আল বেঁধে বৃষ্টির পানি জমিয়ে ধান চাষ করা হয় এবং তাতে ফলনও বেশ ভাল হয়। এসব ভূমিতে ধান ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের রবি শস্যেরও চাষ করা হয়।

তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, নাগর, মহানন্দা প্রভৃতি বড় বড় নদী এবং এগুলির অসংখ্য শাখা ও উপনদী এবং গঙ্গা-পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র -যমুনা নদী বাহিত পলি দ্বারা এবং এসব নদীর ধারে কাছে এই পলিগঠিত উঁচু ভূমির অবস্থান। পলিমাটিতে গঠিত বলে ও পলি (Silt) ও বালির (sand) সঙ্গে কাদার সংমিশ্রণের তারতম্য অনুসারে এ ভূমির মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম রকমভেদ আছে। পলিজ বালি, পলিজ সিল্ট, পলিজ সিল্ট ও কাদা, বিলজাত পলল অবক্ষেপ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে এ ভূমিকে ভাগ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে মোটামুটিভাবে এভূমিকে পলিমাটিতে গঠিত উঁচু ভূমি বলা যেতে পারে।

দিনাজপুর জেলার তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, দেবীগঞ্জ, বোদা ও অটোয়ারি থানা সমূহের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ, ঠাকুরগাঁও, বালিয়াডাঙ্গি, পীরগঞ্জ, রানি সংকইল, হরিপুর, বীরগঞ্জ, খানসামা, দিনাজপুর সদর, চিরির বন্দর থানা সমূহের অংশ বিশেষে দিনাজপুর জেলায় এ ভূমির অস্তিত্ব দেখা যায়। পার্শ্ববর্তী রংপুর জেলার ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, তারাগঞ্জ কিশোরগঞ্জ,

পীরগাছা, গঙ্গাচরা, হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট থানা সমূহের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং নীলফামারী, রংপুর, সাদুল্লাপুর ও পলাশবাড়ি থানার অংশ বিশেষ নিয়ে রংপুর জেলায় এ অঞ্চল গঠিত। বগুড়া জেলায় এ অঞ্চল খুবই সীমাবদ্ধ। তবে গাবতলী, সারিয়াকান্দি, বগুড়া সদর, শিবগঞ্জ, ধুনট ও নন্দীগ্রাম থানার কিছু কিছু অংশে এ ভূমির অস্তিত্ব দেখা যায়। পাবনা জেলার সাঁথিয়া, শাহ্জাদপুর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, চাটমোহর, ঈশ্বরদি ও পাবনা সদর থানার স্থানে স্থানে এই পলি মাটির উঁচু ভূমি দেখা যায়। রাজশাহী জেলাতে এ ভূমির অস্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। চাঁপাই নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, তানোর, নাচোল, মান্দা, সিংড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর সদর, গুরুদাসপুর প্রভৃতি থানার অংশবিশেষে এ ভূমির অস্তিত্ব আছে। তদুপরি পবা, চারঘাট, পুঠিয়া, লালপুর, রানিনগর, বদলগাছি, দুর্গাপুর, বাঘমারা, নওগাঁ সদর, ধামইরহাট, মহাদেবপুর, পত্নীতলা প্রভৃতি থানাতেও এই ভূমির অস্তিত্ব স্থানে স্থানে দেখা যায়।

একমাত্র সুবিখ্যাত চলনবিল ব্যতীত বরেন্দ্র ভূমির সব বিলও এ ভূমির মধ্যে পড়ে। চলনবিল সম্বন্ধে এ গ্রন্থে আলাদা প্রবন্ধ আছে। বিলজাত পলল অবক্ষেপ নামে পরিচিত এসব বিলের মধ্যে আছে চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভোলাহাট থানার ভাটিয়া বিল, পোরশা থানার বড় মীর্জাপুর বিল, গোদাগাড়ি থানার পালতোলা বিল এবং অন্যান্য বিলের মধ্যে চাকচাকি, হাবুল, ঘুকড়ি, ঘুকুশি, কাকন, মান্দা, সিদ্ধেধর, ঘানা, উত্তাই, হিমনা, কুমারী, শোনা, বাগশিমলী, মালঞ্চী, আজুম, আংরা, পেদ্দা, সেউতি, গোস্তী, পারুল, সোনাইকান্দা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দিনাজপুর জেলায় একমাত্র ভোমরাদহ ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বিল নেই। রংপুর জেলার মধ্যে পীরগঞ্জ থানার বড়বিলা, বদরগঞ্জ থানার চাপড়া বিল, রংপুর সদর থানার লানিপাকের বিল, কুড়িগ্রাম থানার টোগরাই বিল এবং অন্যান্য থানার ককরুল, চিকলি, হাড়িশর, বিল, পোড়া, বুকশোল্লা , চাওড়া প্রভৃতি বিল উল্লেখযোগ্য। বগুড়া জেলার আদমদিঘি থানার রক্তদহ বিল, বগুড়া সদর ও শিবগঞ্জ থানার সোমরাইল , কালিদহ, সুবিল প্রবৃতি বিল ছিল উল্লেখযোগ্য। পাবনা জেলার চলন বিল সুবিখ্যাত। এ সম্বন্ধে আলাদা একটি প্রবন্ধ আছে এবং তা পরে দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিলের মধ্যে গানজা বিল, বেরা বিল, সোনাপতিল বিল কুড়ালিয়া বিল ও দিকতী বিল উল্লেখযোগ্য ।

(৩) নব গঠিত নিম্ন প্লাবন ভূমিঃ বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন নদী বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র -যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা, তিস্তা-করতোয়া, মহানন্দা-পুনর্ভবা প্রভৃতি নদী বাহিত পলি ও বালি স্তূপীকৃত হয়ে এর নিম্ন প্লাবন ভূমি সৃষ্টি করেছে। প্রধান প্রধান নদী বিশেষ করে পদ্মা ও যমুনা নদী বাহিত পলি ও বালিদ্বারা সৃষ্টি এই নিম্নভূমি বর্ষাকালে পানির নিচে তলিয়ে যায়। স্থানে স্থানে মাটি উচুঁ করে নির্মিত গ্রামগুলি বর্ষাকালে পানি দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপের মত দেখায়। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ ধরনের ভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলের স্থানে স্থানে দেখা যায়।

রংপুর জেলার উত্তর-পূর্বাংশে বিশেষ করে বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলায় বৃহত্তর রংপুর জেলার প্রায় এক দশমাংশ স্থান জুড়ে এই নিম্ন প্লাবন ভূমি অবস্থিত। কুড়িগ্রাম সদর , উলিপুর, চিলমারি, রৌমারি, সুন্দরপুর, ধুশমারি, রাজিবপুর, ফুলছড়ি, সাঘাটা প্রভৃতি থানা

সমূহ জুড়ে রংপুর জেলায় এই অঞ্চল অবস্থিত। বগুড়া জেলার গাবতলী, সারিয়াকান্দি, বগুড়া সদর ও শেরপুর থানা সমূহের অংশবিশেষে এ অঞ্চল বিদ্যমান। পাবনা জেলার কাজীপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বেলকুচি, উল্লাপাড়া, শাহ্জাদপুর, বেড়া, পাবনা সদর প্রভৃতি থানাগুলির অংশবিশেষে এই নিম্ন প্লাবন ভূমি দেখা যায়।

এসব ভূমি বর্ষার পানিতে ডুবে যায় এবং এখানে বুনা আমন ধান, পাট ইত্যাদি শস্য উৎপাদন করা হয় এবং বর্ষা শেষে পানি সরে গেলে রবিশস্য করা হয়। এ জমি প্রত্যেক বছর পলিমাটি পড়ার জন্য বেশ উর্বরা হয়। রাজশাহী জেলায় এই নিম্ন প্লাবন ভূমির পরিমাণ খুব বেশি নয়। পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় এই ভূমির কিছু কিছু অস্তিত্ব দেখা যায়। আর দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চলন বিল এলাকায়।

বরেন্দ্র ভূমির ভৌগোলিক বিবরণের মধ্যে নদ-নদী, জীব জন্তু, বন সম্পদ, কৃষি সম্পদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থাকা আবশ্যক। তবে এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আছে বলে এখানে এ সম্বন্ধে আর আলোচনা করা হল না।

তথ্যপঞ্জি

১. সুনীল চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-২০৬।

২. The Ramacharitam of Sandyakara Nandi, edited by dr. R.C. Majumdar, Dr. Radhagobinda Basak and Pandit Nanigopal Banerji, published by Varendra Research Museum, P. 153.

৩. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৪০৩ সাল, পৃ-১১৬।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. তবকাত-ই-নাসিরী ঃ মূল রচনা মীনহাজ-ই-সিরাজ, বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা, আ. কা. মোঃ যাকারিয়া, পৃ-৫৮-৫৯।

৬. M.A. Zaher and Anisur Rahman : Prospects and Investigation for Minerals in the Northern Part of Bangladesh, Seminar & Exhibition, 08-12 October, 1980. Page 15. (Petroleum & Mineral Resources of Bangladesh). হাল আমলে এ অঞ্চলে বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া অঞ্চলে আরও ৬টি কূপ খননের খবর বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সঠিক তথ্যের অভাবে এখানে সেগুলির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হলনা।

–প্রবন্ধকার।

৭. অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী রচিত PREHISTORY & PROTOHISTORY OF EASTERN INDIA গ্রন্থের ৫ ও ৬ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।